শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান

প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা

বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ

অবতারের অবতরণ বেদোদ্ধারের উদ্দেশ্যে। পুরাণে দেখা যায়, বেদ যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল তখন ভগবান মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে বেদকে উদ্ধার করেছিলেন। সাধারণ মানুষের বোঝার জন্য এটি একটি প্রতীকী গল্প। স্বামী বিবেকানন্দ জানিয়েছেন বেদ নিত্য সত্য বা চিরন্তন নিয়ম :

''সত্য দুই প্রকার। এক—যাহা মানব-সাধারণের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য। দুই—যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য। প্রথম উপায় দ্বারা সংকলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সংকলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়।

''বেদ নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং যাহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন।...

''সমস্ত দেশকালপাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশবিশেষে, কালবিশেষে বা পাত্রবিশেষে বদ্ধ নহে।

''সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র বেদ।

''অলৌকিক জ্ঞানবেত্তৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস-পুরাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদিদেশীয় ধর্মপুস্তকসমূহে যদিও বর্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আর্যজাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ 'বেদ'-নামধেয় চতুর্বিভক্ত অক্ষররাশি সর্বতোভাবে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্মপুস্তকের প্রমাণভূমি।''

যখন ভারতবর্ষের মানুষ ভুলে গিয়েছিল তারা ঋষির বংশধর, তারা আত্মবিস্মৃত হয়ে ইতিকর্তব্য ভুলে গিয়েছিল, যখন তাদের এতটাই অধঃপতন হয়েছিল যে তারা বেদের প্রকৃত অর্থই ভুলতে বসেছিল, তখনই ভগবান বেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইটিই বেদোদ্ধারের প্রকৃত অর্থ। কেন এই অধঃপতন? স্বামীজী ব্যাখ্যা করেছেন : ''সৎশাস্ত্রবিগর্হিত ও সদাচারবিরোধী একমাত্র লোকাচারের বশবর্তী হওয়াই আর্যজাতির অধঃপতনের এক প্রধান কারণ।''

কেন ভগবান পৃথিবীতে নেমে এলেন? স্বামীজীর উত্তর : ''কালবশে সদাচারভ্রষ্ট,

বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান... অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া, তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া, যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—তখন... কালবশে নষ্ট এই সনাতনধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।”

ভগবান ‘বেদমূর্তি’—বেদের মূর্তপ্রকাশ। অন্য- ভাবে বলতে গেলে তিনি সত্যস্বরূপ। তাই তিনি ক্ষুদিরামের গৃহটি নির্বাচন করে নিলেন।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রমণি দেবী। ধর্মপ্রাণ দম্পতি। বাসস্থান দেরে গ্রাম। গ্রামের বিত্তশালী জমিদার ক্ষুদিরামকে বললেন মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে। সত্যনিষ্ঠ ক্ষুদিরামের পক্ষে এ যে একেবারেই অসম্ভব! ক্ষুদিরাম রাজি হলেন না। ফলে তাঁকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করলেন জমিদার। কপর্দকশূন্য অবস্থায় স্ত্রী ও তিন সন্তানের হাত ধরে পথে নামতে হল তাঁকে। আদর্শের কাছে পরাজিত হল প্রলোভন।

সেই ক্ষুদিরাম গয়াতীর্থে স্বপ্ন দেখলেন, স্বয়ং গদাধর বিষ্ণু পুত্ররূপে আসতে চাইছেন তাঁর গৃহে। স্বপ্ন সত্য কি না এ-বিষয়ে আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সংশয়ও থাকবে না, যখন আমরা গভীরভাবে অনুধাবন করব কতদূর সত্যনিষ্ঠা থাকলে একজন মানুষ সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিতে পারেন! একথা ভাবলে আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না যে, একটা মিথ্যা সাক্ষ্যে যেখানে বেঁচে থাকার সমস্ত সুখসামগ্রী অনায়াসে পেতে পারতেন, সেখানে শুধু সত্যের জন্য তিনি সব অবহেলায় ত্যাগ করলেন। এইরকম সত্যে যাঁর জীবন প্রতিষ্ঠিত, তিনি যখন বলেন যে ভগবান তাঁর ঘরে আসবেন বলেছেন, তখন তাঁকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ থাকে না। সত্যনিষ্ঠ ক্ষুদিরামকে সত্যস্বরূপ ভগবান তাঁর পুত্ররূপে এসে কৃপা করলেন।

সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রম্

কলিযুগে মানুষের মন সংশয়গ্রস্ত। স্বামীজী একে বলেছেন ‘সংশয়রাক্ষস’। আজকের মানুষ সবকিছুরই প্রমাণ চায়। আধুনিক বিজ্ঞান এই সংশয়গ্রস্ত মনকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

এবার শ্রীভগবান স্বয়ং কৃপা করে প্রতিপদে

প্রমাণ দিতে উদ্যত হয়েছেন। তিনি এযুগে এমন পিতামাতাকে বেছে নিয়েছেন—যাঁরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত, আবার নিজে থেকেছেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। আমাদের শাস্ত্র বলেন, বেদ 'অপৌরুষেয়'—স্বয়ংপ্রকাশ, অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান। স্বামীজীর ভাষায়, ''[বেদ কীরূপে] ঋষিহৃদয়ে আবির্ভূত হন, তাহা দেখাইবার জন্য ও এবম্প্রকারে শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে ধর্মের পুনরুদ্ধার, পুনঃস্থাপন ও পুনঃপ্রচার হইবে, এইজন্য বেদমূর্তি ভগবান এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।'' শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন, তাঁর কোনও পুঁথিগত বিদ্যা না থাকা সত্ত্বেও বেদগত জ্ঞান তাঁর মধ্যে পূর্ণ প্রকাশিত।

অনন্ত ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ

অবতার আসেন যুগোপযোগী প্রয়োজন সাধন করতে। উনিশ শতকে ভারতবর্ষের প্রথম প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন পথের মধ্যে মূল ঐক্য অন্বেষণ। ''পতনাবস্থায় সনাতন ধর্মের সমগ্র ভাব-সমষ্টি অধিকারিহীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়-আকারে পরিরক্ষিত হইতেছিল এবং অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছিল।'' ভারতবর্ষের এমন অবস্থা হয়েছিল যে, বেদান্তের সূক্ষ্মতত্ত্ব তো দূর, পুরাণ বা তন্ত্রেরও মর্মগ্রহণে মানুষ অসমর্থ হয়ে পড়েছিল। অনন্ত ভাবের সমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধে মানুষ উন্মত্তপ্রায় হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা 'স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ' হয়ে পড়ল। হিন্দুধর্মে যথার্থ একতা কোথায় তা দেখাতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ নিজের জীবনে নিহিত করে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হয়ে লোকহিতায় সর্বসমক্ষে নিজের জীবন প্রদর্শন করবার জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন।

সমন্বয়াচার্যরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

এইসময় ভগবান এসেছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে—সেটি হল সমন্বয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের অন্যতম মূল কথা সমন্বয়। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম থেকেই পিতামাতাকে দেখিয়েছেন তাঁর স্বরূপ। পিতা স্বপ্ন দেখেছেন বিষ্ণু তাঁর কাছে পুত্ররূপে আসতে চান। দারিদ্র্য সেখানে কোনও বাধা হয়নি, বরং প্রসন্ন হয়ে ভগবান জানিয়েছেন, দরিদ্র পিতা তাঁকে যা দেবেন তিনি তৃপ্তির সঙ্গে তা-ই গ্রহণ করবেন। আর জননী দর্শন করেছেন, শিবমন্দিরে মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ থেকে দিব্যজ্যোতি নির্গত হয়ে মন্দির পূর্ণ করেছে এবং বায়ুর মতো তরঙ্গাকারে ছুটে এসে তাঁর ভিতরে প্রবেশ করছে। এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ যে একাধারে শিব ও বিষ্ণুর অবতার তা প্রতিষ্ঠিত করলেন সত্যে প্রতিষ্ঠ পিতামাতাকে দর্শন দিয়ে, যাতে উত্তরকাল একইসঙ্গে শিব ও বিষ্ণুর অবতার বলে তাঁকে অস্বীকার করতে না পারে।

নিজমুখে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীকার করেছেন, যে রাম যে কৃষ্ণ সে-ই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ। জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন তাঁর কথা বলার শক্তিটুকুও নেই সেইসময় এত জোর দিয়ে দৃঢ়স্বরে কথাগুলি উচ্চারণ করেছেন—যা শুনে স্বামী বিবেকানন্দ চমকে উঠেছিলেন, আসল সত্যটি তাঁর নিজের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেটিই তিনি 'আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো' স্তোত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেবলমাত্র সনাতন ধর্মের পালন ও অভ্যাসই করেননি, পৃথিবীর সব ধর্মের সত্যতা নিজের জীবনে সাধনা করে প্রমাণ করেছেন—যা বর্তমানে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

এই কথাগুলিই স্বামীজী বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা

প্রসঙ্গে খুব সহজ করে বলেছেন শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে—''ঠাকুর আমাদের সর্বভাবের সাক্ষাৎ সমন্বয়মূর্তি! ওই সমন্বয়ের ভাবটি এখানে জাগিয়ে রাখলে ঠাকুর জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। সর্বমত, সর্বপথ, আচণ্ডাল, ব্রাহ্মণ সকলে যাতে এখানে এসে আপন আদর্শ দেখতে পায়, তা করতে হবে।''

সঙ্ঘের প্রতীকরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামীজী জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগের সমন্বয়কে রূপ দিলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতীকে। এর ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, ''চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্প পরিবেষ্টনটি যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংস প্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়, চিত্রের ইহাই অর্থ।'' বলা হয়, প্রতীকটির মাধ্যমে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকেই রূপদান করেছেন।

মন্দিরের শিল্পকলায় শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামীজী চেয়েছিলেন বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের স্থাপত্য হবে শ্রীরামকৃষ্ণের

বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির : দেশ-বিদেশের স্থাপত্যের ঐকতান

আচরিত ধর্ম ও প্রচারিত তত্ত্বের রূপায়ণ। বিবেকানন্দ একাজের ভার দিয়েছিলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দের ওপর। মার্টিন কোম্পানির হাতে নির্মাণের ভার দেওয়া হয়েছিল। কোম্পানির স্থপতি মেজর হেরল্ড ব্রাউন স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সঙ্গে মন্দিরের নকশা নিয়ে আলোচনা করে জানিয়েছেন, ''স্বামী বিবেকানন্দের নকশা থেকে তিনটি জিনিস প্রতীয়মান হয় : প্রথমত স্বামীজী চেয়েছেন গর্ভমন্দিরের ছাদটি হবে গম্বুজাকৃতি (যা মুসলিম ধর্মের বৈশিষ্ট্য), দ্বিতীয়ত ইউরোপীয় চার্চের মতো নাটমন্দির গর্ভমন্দির একসঙ্গে যুক্ত থাকবে, তৃতীয়ত মন্দিরটির অলংকরণ হবে ভারতীয় রীতিতে।'' ভারতের বিভিন্ন শিল্পকলার সমন্বয় ঘটেছে এই মন্দিরে। উদাহরণস্বরূপ গর্ভমন্দির বেষ্টন করে রয়েছে নবগ্রহের মূর্তি যা ওড়িশার ভুবনেশ্বর ও কোনারকে দেখা যায়। প্রবেশপথে আছে বৌদ্ধ গুহা স্থাপত্যরীতির খিলান, প্রবেশপথের দুপাশের স্তম্ভ চিতোরের কীর্তিস্তম্ভের অনুরূপ। এভাবে একই মন্দিরে মিলে গেছে মন্দির, মসজিদ, গির্জা, চৈত্য। সবকিছু মিলিয়ে এক আশ্চর্য সৌন্দর্যমণ্ডিত সৃষ্টি।

গর্ভমন্দিরের মাথায়
গম্বুজের সমাবেশ

স্টুডিওতে তোলা ছবি

ছায়া আর কায়া সমান

যাঁকে কেন্দ্র করে এই সৃষ্টি, যাঁর সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন তাঁর দিকে তাকালে আমাদের মোহ দূর হয়, তিনি কেমন? কেমন তাঁর অপার্থিব সৌন্দর্য? যিনি দেহে এসেছিলেন তাঁর দেহত্যাগের পর বিশ্বজগৎ তাঁকে দেখবে কেমন করে, তার ব্যবস্থাও তিনি করে গেছেন। রাম বা কৃষ্ণের রূপ আমাদের কল্পনা করতে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ এবার আমাদের সে-অবসর রাখেননি। তিনি জানেন, আমরা হয়তো শিব গড়তে বাঁদর গড়ব। সেজন্য

দিব্যদ্রষ্টা আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর ফটোগ্রাফ। ১৮৮১ সালের ১০ ডিসেম্বর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র শ্রীরামকৃষ্ণকে গাড়ি করে বেঙ্গল ফটোগ্রাফারের স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে ফটো তোলান। স্তম্ভের গায়ে হাত রাখা এই ছবিটি সকলেরই পরিচিত। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে ছবি তোলা সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি। তিনি কেশবকে বলেন, ''আজ বেশ কলে ছবি তোলা দেখে এলুম। একটি দেখলুম যে শুধু কাঁচের ওপর ছবি থাকে না। কাঁচের পিঠে একটা কালি মাখিয়ে দেয়, তবে ছবি থাকে। তেমনই ঈশ্বরীয় কথা শুধু শুনে যাচ্ছি, তাতে কিছু হয় না, আবার তৎক্ষণাৎ ভুলে যায়। যদি ভিতরে অনুরাগ ভক্তিরূপ কালি মাখানো থাকে তবে সে কথাগুলি ধারণা হয়।''

আরাত্রিক স্তবে শ্রীরামকৃষ্ণ

গৃহস্থ থেকে সন্ন্যাসী—আজ সকলেই আরাত্রিক ভজন 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগবন্দন বন্দি তোমায়'-এর সঙ্গে পরিচিত। এই স্তোত্রের প্রতিটি শব্দে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে উপস্থিত করেছেন। শুধুমাত্র উচ্চারণ নয়, মননশীলতার সঙ্গে বিচার করলে সেই সত্য অনুভূত হয়। কলির পাপহত জীব, কে তাকে উদ্ধার করবে? শ্রীরামকৃষ্ণ। সেজন্য স্বামীজী বলছেন, ''মোচন অঘদূষণ, জগভূষণ, চিদ্‌ঘনকায়/ জ্ঞানাঞ্জন-বিমলনয়ন, বীক্ষণে মোহ যায়''—তুমি পাপরূপ মলিনতাকে দূর করে দাও, তুমি জগতের অলঙ্কারস্বরূপ এবং চৈতন্যঘনমূর্তি, জ্ঞানরূপ অঞ্জনে তোমার চক্ষু দুটি নির্মল। সেজন্যই তো সাধনভজনে অশক্ত হলেও ওই চোখদুটি দেখলেই সব মোহ দূর হয়ে যায়। মোহই বন্ধনের কারণ, আর তোমার কৃপাদৃষ্টি সেই বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়।

আবার বলছেন, ''বঞ্চন-কামকাঞ্চন অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয়রাগ/ ত্যাগীশ্বর, হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ।''—তুমি কামকাঞ্চন পরিত্যাগ করেছ, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি অর্থাৎ জগতের ভোগসুখ তোমার নিকট অত্যন্ত নিন্দনীয়। হে ত্যাগিরাজ, হে শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তোমার শ্রীচরণে আমার অনুরাগ দাও।

একটি বক্তৃতায় স্বামীজী বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন, নবযুগের প্রবর্তক, যুগাবতার—তাঁকে বিশ্বাস করো। এবার বলছেন, তোমার প্রতি আমার অনুরাগ দাও। প্রথমে বিশ্বাস, তারপর ভালবাসা, তারপর তাঁর ভাবকে জগতের সম্মুখে উদ্ভাসিত করে তোলা।

যদি শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা স্তোত্রে মূর্ত করে তুলতে চাই তাহলে তা পারব আরাত্রিক ভজনে, যদি পাথরের মধ্যে তাঁকে দেখতে প্রয়াসী হই তাহলে তা পাব বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে; আর প্রতীকে যদি তাঁকে ধরতে চাই, তাহলে তাঁকে পাব সঙ্ঘের প্রতীকটিতে।

বাণীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

কথামৃতকার শ্রীম

শ্রীরামকৃষ্ণের মণিমুক্তার মতো কথাগুলির অনবদ্য সংগ্রহ শ্রীম কথিত 'কথামৃত'। সত্যের অপলাপ যাতে এতটুকু সেখানে না থাকে, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার শ্রীমর মুখ থেকে নিজের বলা কথা বারে বারে শুনে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে সংশোধন করে দিয়েছেন। পরবর্তী কালে কথামৃতের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে ওয়াকিবহাল করার জন্য শ্রীমকে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী বলেছিলেন, ''তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে সেই কথাই সত্য।... একসময় তিনিই তোমার কাছে ওই সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ওই সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই জানিবে।''

জীবের চৈতন্য জাগ্রত করতেই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিরোধানের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু হয়ে সকলকে বলেছিলেন, ''তোমাদের চৈতন্য হোক।'' তাঁর আশীর্বাদ তো মিথ্যা হতে পারে না!

কথামৃত তাঁর সেই আশীর্বাদের সোপান, আমাদের করতলাশ্রিত মন্দির। কর্ণাটকের বিখ্যাত কবি কুভেম্পু এই ভাবটি প্রকাশ করেছেন : মন্দির বা তীর্থস্থান কলুষিত হলেও হতে পারে, কিন্তু এই কথামৃতরূপ মন্দির চিরদিন নির্মলই থাকবে। যার গৃহে কথামৃত থাকে, সেই গৃহ হয়ে ওঠে দেবদেউল। হাত দিয়ে কেউ যদি কথামৃত স্পর্শ করে, সে নিজের অজান্তেই ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করে। কথামৃত অমৃতের সাগর। শাস্ত্রের অত্যন্ত কঠিন তত্ত্ব এতে সহজ সরল করে বলা হয়েছে। কথামৃত আমাদের দুঃখে বন্ধু, সুখে গুরু,পথপ্রদর্শক, জীবনের ধ্রুবতারা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতায় যে-উপদেশ দিয়েছেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে তার অর্থ বোঝা কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ, সরল উপমা চয়ন করে পরমসত্যকে আপামর বদ্ধজীবের কাছে যেভাবে তুলে ধরেছেন, তারই প্রকাশ কথামৃতে। সে-কারণে কথামৃত যুগোপযোগী, কলিকল্মষনাশক, দিব্যামৃত। এর মাঝে ভগবান যেন নিজেকে ধরা দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আর তাঁর কথামৃত যেন অঙ্গাঙ্গী, যেমন ভাগবত-ভক্ত-ভগবান।

আজকের এই দুঃসময়ে আসুন আমরা সকলে শ্রীরামকৃষ্ণকেই আশ্রয় করি, বলি—

''তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।''